Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XII, Issue-III, April 2024, Page No51-58
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

মহাভারতের উপাখ্যান ও 'শর্ম্মিষ্ঠা নাটক': প্রসঙ্গ কাহিনির গ্রহণ-বর্জন

শিবনাথ দত্ত

গবেষক, বাংলা বিভাগ, ভাষা-ভবন, বিশ্বভারতী মহাবিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:

'Sharmmishtha Natak' by Madhusudan Dutta is the first Bengali play written in the European style. This 'Sharmmishtha Natak' is widely known and discussed in the history of the Bengali plays. At the time of writing, this play was criticized by the antiquarians and greatly congratulated by the modernists for its style. Its modern style and tastefulness are also highlighted many times. This play is widely discussed in the later period as well. But how the basic story of the Mahabharata was changed in his play and how much that change is valuable for the dramatic action did not get so much attention. We are going to discuss this topic here. The basic story of the Aadiparva and the story described by Madhusudan both will be compared keeping side by side. Sometimes, according to us, the basic story could be more helpful for the dramatic action of this play than the story described by Madhusudan. In addition, that could be more helpful for the growth of its characters, except in some rare cases. The metaphorical significance of the story in this play will also be important in our discussion.

Key words: Madhusudan Dutta, Sharmmishtha Natak, Mahabharata, Yayati-story, Comparism.

মধুসূদন দত্তের 'শর্ম্মিষ্ঠা নাটক' বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসের মোটামুটি প্রথম দিকেই লেখা। বেলগাছিয়া নাট্যশালায় সমকালীন নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্নের 'রত্নাবলী' নাটকের অভিনয় দেখে হতাশ হয়ে বাংলা ভাষায় ইউরোপীয় রীতিতে নাটক লেখার পরিকল্পনা মধুসূদন দত্ত করেছিলেন। কিন্তু নাটকের বিষয় হিসেবে তিনি বেছে নিয়েছিলেন প্রাচীন ভারতীয় পৌরাণিক সাহিত্যকেই। উনিশ শতকে শিক্ষিত বাঙালিমানসে রেনেসাঁস বা নবজাগরণের প্রভাবজাত স্বদেশপ্রীতির কথা এ-প্রসঙ্গে বলা যায়, যার অন্যতম লক্ষণ হল অতীত ঐতিহ্যের প্রতি গৌরববোধ ও অনুরাগ। খ্রিষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত হলেও মধুসূদন দত্তের প্রধান আকর্ষণ ছিল ভারতীয় পৌরাণিক সাহিত্যের প্রতি। বাংলা ভাষায় প্রথম নাটক রচনা করতে গিয়ে তিনি মহাভারতের যযাতি-উপাখ্যানকে বেছে নিয়েছেন। মহাভারতের কাহিনি তাঁর হাতে কীভাবে রূপ পেয়েছে, তা আমরা আমাদের এই আলোচনায় দেখার চেষ্টা করব।

মধুসূদন দত্তের রচনায় পৌরাণিক প্রভাব ও প্রসঙ্গ প্রচুর দেখা যায়। সমালোচক মানস মজুমদার মনে করেছেন, "...সাহিত্য যদি হয় শিল্পী মধুসূদনের প্রেয়সী, পুরাণ তবে তাঁর জননী।"[১] বাল্য বয়স থেকেই

মধুসূদনের পুরাণপ্রীতি ছিল বলে জানা যায়। মাতা জাহ্নবী দেবীর কাছে ছোটোবেলাতেই তিনি রামায়ণ ও মহাভারতের গল্প শুনেছিলেন। পরবর্তী সময়ে তিনি দেশীয় ও বৈদেশিক পুরাণের পাঠ নিয়েছিলেন। 'শর্ম্মিষ্ঠা নাটক' রচনার পূর্বেও মধুসূদন দত্ত এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে বেশ কিছু বাংলা ও সংস্কৃত বই এনে পড়েছিলেন।[২] ড. অজিতকুমার ঘোষের মতে, এই শেষোক্ত কারণেই তিনি মহাভারতের কাহিনিকে নাটক রচনার জন্য নির্বাচন করেছিলেন।[৩]

মধুসূদন তাঁর নাটক রচনার জন্য মহাভারতের একটি উপ-কাহিনি আশ্রয় করলেও সমকালীন বাঙালির সমাজজীবনের প্রভাব তাঁর নাটকে কোনো না কোনোভাবে থাকা স্বাভাবিক। তাছাড়া মহাকাব্যের একটি উপ-কাহিনিকে নাট্যরূপ দানের ক্ষেত্রেও কিছু কিছু পরিবর্তনসাধনও প্রয়োজনীয়। 'শর্ম্মিষ্ঠা নাটক'-এ মহাভারতের কাহিনির তেমন বড়ো কোনো পরিবর্তন না হলেও ছোটো ছোটো বেশ কিছু গ্রহণ, বর্জন, রূপান্তর ও সংযোজন আমাদের চোখে পড়ে। সমকালীন বাঙালি জীবন এবং উনিশ শতকের বাংলার সাংস্কৃতিক আবহাওয়া সেখানে কীভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে, তা আমরা আমাদের আলোচনায় দেখব। মহাভারতে বর্ণিত মূল ঘটনার পরিবর্তন তাঁর 'শর্ম্মিষ্ঠা নাটক'-এর নাট্যরসের পক্ষে কতটা সহায়ক হয়েছে, সে-বিষয়টিকেও আমরা এই আলোচনায় গুরুত্ব দেব।

এ-প্রসঙ্গে আলোচনা করার পূর্বে মহাভারতে যযাতি-উপাখ্যানের কাহিনি কীভাবে বর্ণিত হয়েছে, তা সংক্ষেপে উল্লেখ করা প্রয়োজন। শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানী, অসুররাজ বৃষপর্বার কন্যা শর্মিষ্ঠা ও তাঁদের সখীরা জলবিহার করতে গেলে দেবরাজ ইন্দ্র বায়ুরূপ ধারণ করে তাঁদের পরিধেয় বস্ত্রগুলি মিশ্রিত করে দেন। জলবিহার শেষে শর্মিষ্ঠা ভুলবশত দেবযানীর বস্ত্র পরিধান করলে দেবযানী কুপিত হয়ে তাঁকে অসুরকন্যা বলে ভর্ৎসনা করেন। অন্যদিকে শর্মিষ্ঠাও তাঁকে ভিক্ষুকের কন্যা বলে অপমান করেন এবং বলেন যে তাঁর পিতা বৃষপর্বার কাছে স্তব-প্রতিগ্রহ করেই দেবযানীর পিতা শুক্রাচার্য জীবিকানির্বাহ করে থাকেন। তাই তিনি দেবযানীকে সমকক্ষ বলে গণ্য করেন না। দেবযানী ক্রুদ্ধ হয়ে নিজের বস্ত্র শর্মিষ্ঠার কাছ থেকে কেড়ে নিতে চাইলে শর্মিষ্ঠা তাঁকে একটি কূপে নিক্ষেপ করে সখীদের নিয়ে চলে যান। অন্যদিকে রাজা যযাতি মৃগয়া করতে করতে তৃষ্ণার্ত হয়ে জল পান করতে এসে দেবযানীকে দেখতে পেয়ে কূপ থেকে উদ্ধার করেন। শুক্রাচার্য সান্ত্বনা দিলেও দেবযানীর ক্রোধ শান্ত হয় না। শুক্রাচার্য কন্যাকে নিয়ে অন্যত্র চলে যাবার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু দেবতাদের সঙ্গে যুদ্ধে অসুরদের একমাত্র ভরসা ছিল শুক্রাচার্যের পরামর্শ। তাই অসুররাজ বৃষপর্বা শুক্রাচার্যের কাছে অনুনয়-বিনয় করেন এবং দেবযানী বলেন যে শর্মিষ্ঠা আজীবন তাঁর দাসত্ব স্বীকার করলে তাঁর ক্রোধশান্তি হবে। বৃষপর্বা ও শর্মিষ্ঠা এই শর্ত মেনে নেন। পরবর্তী সময়ে রাজা যযাতি আবার মৃগয়ায় এসে দেবযানী ও শর্মিষ্ঠাকে দেখতে পেয়ে তাঁদের পরিচয় গ্রহণ করতে উৎসুক হন। যযাতি শর্মিষ্ঠার বিষয়ে কৌতূহলী হলেও দেবযানী তাঁকে বিবাহের প্রস্তাব দেন। ব্রাহ্মণ উচ্চবর্ণ হওয়ায় ক্ষত্রিয় রাজা যযাতি তাঁকে বিবাহ করতে সম্মত হতে পারেন না। কিন্তু দেবযানী যুক্তি দিয়ে বলেন যে পূর্বেই কূপ থেকে উদ্ধার করার সময় যযাতি তাঁর পাণিগ্রহণ করেছিলেন। শুক্রাচার্য এই বিবাহে সম্মতি দেন এবং যযাতি যাতে শর্মিষ্ঠাকে বিবাহ না করেন, সে বিষয়ে সাবধান করে দেন। পরবর্তীতে দেবযানী পুত্রবতী হলে শর্মিষ্ঠা তাঁর যৌবন ব্যর্থ হচ্ছে মনে করে সন্তান কামনায় রাজা যযাতিকে নির্জনে পতিত্বে বরণ করতে চান। শর্মিষ্ঠার প্রতি ঔৎসুক্য থাকলেও শুক্রাচার্যের সাবধানবাণী স্মরণ করে যযাতি তাতে স্বীকৃত হতে পারেন না। কিন্তু শর্মিষ্ঠা বিভিন্ন যুক্তিতর্কের মাধ্যমে যযাতিকে বিবাহে উৎসাহিত করেন। দেবযানীর গর্ভে যদু ও তুর্বসু এবং শর্মিষ্ঠার গর্ভে একে একে দ্রুহ্য, অনু ও পুরু নামে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করে। শর্মিষ্ঠার গর্ভে যযাতির

পুত্র উৎপাদন বিষয়ে অবগত হয়ে দেবযানী শুক্রাচার্যের কাছে গমন করেন এবং শুক্রাচার্য যযাতিকে রোষভরে অকালবার্ধক্যের অভিশাপ দেন। যযাতি যৌবনসুখ অনুভব করে পরিতৃপ্ত হননি এই কথা বলে অনুনয়-বিনয় করলে শুক্রাচার্য বলেন তিনি তাঁর বার্ধক্য অন্য কারো দেহে সঞ্চার করতে পারবেন। তখন যযাতি বলেন যে তাঁর যে-পুত্র তাঁর বার্ধক্য গ্রহণ করে তাঁকে মুক্ত করবে, তাকেই তিনি রাজত্বের উত্তরাধিকার দান করবেন। শর্মিষ্ঠার গর্ভজাত কনিষ্ঠ পুত্র পুরু যযাতির বার্ধক্য গ্রহণে স্বীকৃত হন এবং দেহত্যাগের পূর্বে যযাতি পুরুকেই রাজত্বে অভিষিক্ত করেন।[৪]

উনিশ শতকের বাংলার সামাজিক অবস্থা ও সমকালীন সাংস্কৃতিক আবহের প্রভাব মধুসূদন দত্তের 'শর্ম্মিষ্ঠা নাটক'-এর চরিত্র রূপায়ণে দেখতে পাওয়া যায়। মধুসূদন তাঁর 'শর্ম্মিষ্ঠা নাটক'-এর প্রধান চরিত্রগুলি মহাভারত থেকে গ্রহণ করেছেন। এগুলি হল— শর্মিষ্ঠা, দেবযানী, যযাতি, শুক্রাচার্য, বৃষপর্বা প্রভৃতি। মহাভারতে এই চরিত্রগুলি যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, মধুসূদন তাঁর নাটকে কিন্তু হুবহু সেভাবে বর্ণনা করেননি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে চরিত্রগুলির পরিবর্তনসাধন তিনি করেছেন। এই পরিবর্তন কিছুটা যেমন নাটকের প্রয়োজনে, তেমনি সেই সঙ্গে একদিকে মধুসূদনের পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ এবং উনিশ শতকের বাঙালি সমাজ ও সমকালীন মূল্যবোধ সেখানে প্রভাব বিস্তার করেছে। এক একজন চরিত্রকে নিয়ে উদাহরণ সহযোগে আমরা বিষয়টি দেখাব।

মহাভারতের শর্মিষ্ঠা চরিত্র ছিল অনেক বেশি প্রগল্‌ভ। সমালোচক তপন মণ্ডলের ভাষায় 'প্রতিবাদিনী ও কলহপটু' একজন নারী।[৫] মহাভারতে যযাতিকে তিনি সরাসরি মিলনের জন্য আহ্বান জানিয়েছেন— "হে রাজন্! আমার কুল, শীল, রূপ, যৌবন প্রভৃতি কিছুই আপনার অবিদিত নহে। সম্প্রতি আমি বিনয়পূর্ব্বক প্রার্থনা করি, আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার ঋতুরক্ষা করুন।"[৬] কিন্তু মধুসূদন তাঁর নাটকে শর্মিষ্ঠা চরিত্রটিকে অন্যভাবে রূপায়ণ করেছেন। তাঁর শর্মিষ্ঠা যযাতির প্রতি প্রণয়াসক্ত হলেও মহাভারতের শর্মিষ্ঠার মতো আহ্বান জানাতে পারেননি। সেখানে দেখা যায় যযাতি শর্মিষ্ঠার মনোভাব বুঝতে পেরে তাঁকে বিবাহের প্রস্তাব দেন। শর্মিষ্ঠা ও যযাতির এই অংশের কথোপকথন নাটক থেকে তুলে ধরলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে—

> **শর্ম্মি। (কৃতাঞ্জলিপুটে) হে নরেশ্বর, আমি রাজমহিষীর একজন পরিচারিকা মাত্র; তা দাসীকে আপনার এই প্রকারের সম্বোধন করা উচিত হয় না।**
>
> **রাজা। না, না, সুন্দরি! তুমি সাক্ষাৎ রাজলক্ষ্মী! যা হৌক, যদ্যপি তুমি মহিষীর সহচরী হও, তবে তোমাতে আমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। অতএব হে ভদ্রে, তুমি আমাকে বরণ কর।**[৭]

মহাভারতে কিন্তু অধর্ম ও শুক্রাচার্যের অভিশাপের ভয়ে যযাতিই শর্মিষ্ঠাকে গ্রহণ করতে চাননি। তখন অনুরূপ যুক্তি আমরা শর্মিষ্ঠার মুখে শুনেছিলাম— "সখীর পতি ও আমার পতি উভয়েই তুল্য এবং একের বিবাহে অন্যেরও বিবাহ সিদ্ধ হইয়া থাকে; অতএব যখন আমার সখী আপনাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছেন, তখন আমারও বরণ করা হইয়াছে।"[৮] মধুসূদনের শর্ম্মিষ্ঠা মহাভারতের তুলনায় অনেক নির্বিবাদী, অদৃষ্টে বিশ্বাসী, সহনশীল। উনিশ শতকের বাঙালি সমাজে নারীকে যেভাবে দেখা হত, শর্মিষ্ঠা চরিত্রের মধ্যে সেই বৈশিষ্ট্যগুলি প্রভাব বিস্তার করেছে বলা যায়। দেবযানীর প্রতি তিনি কোনোরকম ঈর্ষা করেননি। যযাতির প্রতি তাঁর ভালোবাসাও তৎকালীন বাঙালি নারীদের মতো পতিভক্তির রূপ নিয়েছে। সমকালীন বাঙালি সমাজের একটা প্রচ্ছন্ন প্রভাব এখানে ছিল এ-কথা অস্বীকার করা যায় না।

উনিশ শতকের নবজাগরণের প্রভাবজাত যে মূল্যবোধ, তা মধুসূদনের দেবযানী চরিত্রে প্রভাব বিস্তার করেছে বলা যায়। সমকালীন বাঙালি সমাজে পুরুষদের বহুবিবাহের বিরুদ্ধে দেবযানী চরিত্রটি একটি প্রতিবাদ বলে সমালোচকেরা মনে করেছেন।[৯] শর্মিষ্ঠার গর্ভে যযাতির সন্তান উৎপাদনের কথা জানতে পেরে দেবযানী গৃহত্যাগ করেছেন। সখী পূর্ণিকার উদ্দেশ্যে তিনি বলেছেন, "সখি, তুমি কি আমাকে ঐ পাপ নগরীতে ফিরে যেতে এখনও পরামর্শ দাও? এমন নরাধম, পাষণ্ড, পাপী, কৃতঘ্ন পুরুষের মুখ কি আমার আর দেখা উচিত?"[১০] কিন্তু যযাতি শুক্রাচার্যের অভিশাপে জরাগ্রস্ত হয়ে পড়লে মধুসূদনের দেবযানীর যে আক্ষেপ, তা মহাভারতে ছিল না। মধুসূদনের নাটকে শুক্রাচার্যের দ্বারা যযাতিকে অভিশাপ দান করানোর কৃতকর্মের জন্য দেবযানী অনুশোচিত হয়েছেন—

> **রাজ্ঞী। হায়! হায়! সখি, আমার মতন চণ্ডালিনী কি আর আছে? আমি আমার হৃদয়-নিধি সাধ করে হারালেম, আমার জীবনসর্ব্বস্বধন হেলায় নষ্ট কল্যেম। পতিভক্তি হতেও কি আমার ক্রোধ বড় হলো? হায়! হায়! আমি স্বেচ্ছাক্রমে আপনার মন্মথকে ভস্ম কল্যেম! হে জগন্মাতঃ বসুন্ধরে! তুমি আমার মতন পাপীয়সী স্ত্রীর ভার যে এখনও সহ্য কচ্যো?[১১]**

দেবযানীর এই অনুশোচনা না থাকলে তিনি সমকালীন বাঙালি দর্শকদের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারতেন না। কিন্তু 'শর্ম্মিষ্ঠা নাটক'-এ যযাতির কাছে দেবযানীর প্রত্যাবর্তন ও এই অনুশোচনা তাঁর চরিত্রকে ক্ষুণ্ণ করেছে বলে কোনো কোনো সমালোচক অভিমত পোষণ করেছেন।[১২]

মহাভারতের যযাতি চরিত্রটিও মধুসূদনের নাটকে কিছুটা পরিবর্তিতভাবে রূপায়িত হয়েছে বলা যায়। মূল কাহিনিতে যযাতি প্রথম থেকেই শর্মিষ্ঠার প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। কিন্তু মধুসূদন তাঁর নাটকে যযাতিকে প্রথমে দেবযানীর প্রতি ও পরে শর্মিষ্ঠার প্রতি অনুরক্ত হিসেবে দেখিয়েছেন। কিন্তু মিলনান্তক নাটকের নায়ক চরিত্রের এই একইভাবে দুই নারীর প্রতি আকৃষ্ট হওয়া দর্শক বা পাঠকের কাছে খুব একটা গ্রহণযোগ্য নয়। উনিশ শতকের ধনী বাঙালি সম্প্রদায়ের মধ্যে পুরুষের বহুবিবাহ বেশ পরিচিত ছিল। মধুসূদনের 'শর্ম্মিষ্ঠা নাটক'-এর যযাতি চরিত্রে আমরা তার ছবি দেখতে পাই।

মহাভারতের শুক্রাচার্য চরিত্রটি মধুসূদনের হাতে উনিশ শতকের বাংলার প্রাচীনপন্থী রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ হিসেবে রূপায়িত হয়েছে বলে সমালোচক তপন মণ্ডল মনে করেছেন।[১৩] মহাভারতে শর্মিষ্ঠার দাসত্বের শর্ত দেবযানী উচ্চারণ করলেও নাটকে সেই শর্ত শুক্রাচার্যের মুখে উচ্চারিত হতে দেখা যায়। সমকালীন রক্ষণশীল ব্রাহ্মণরা খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী মধুসূদনের প্রতি যেমন কঠোর ব্যবহার করেছেন, নাটকে শুক্র সেরকম শর্মিষ্ঠার প্রতি রূঢ় আচরণ করেছেন।[১৪] মহাভারতে শুক্র যেখানে যযাতি যাতে শর্মিষ্ঠাকে বিবাহ না করেন সে-বিষয়ে সচেতন করে দিয়েছিলেন, মধুসূদনের নাটকের শুক্র সেখানে যযাতির বহুবিবাহের সমর্থন করেছেন। মহাভারতের শুক্রের মতো সরাসরি যযাতিকে অভিশাপ দিতেও তিনি কুণ্ঠিত হয়েছেন। দেবযানীর উপরোধে শাপদান করলেও কারণ হিসেবে বহুবিবাহের পরিবর্তে যযাতির পূর্বজন্মকৃত পাপের কথা বলেছেন।

মহাকাব্যের কাহিনির নাট্যরূপের প্রয়োজনে মধুসূদন মহাভারতের যযাতি-উপাখ্যানের কিছু কিছু পরিবর্তনসাধন করেছেন। এগুলি নাটকের সার্থকতার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে সহায়ক হয়েছে কিনা তা আমাদের বিচার্য। মহাভারতে ঘূর্ণিকা নামে দেবযানীর একজন দাসীর কথা পাওয়া যায়। নাটকে মধুসূদন তার পরিবর্তে পূর্ণিকা নামে একজন সখীর চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। অনুরূপভাবে দেবিকা নামে শর্মিষ্ঠারও একজন

সখী চরিত্র তিনি সংযুক্ত করেন। নাটকে এদের ভূমিকা 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকের অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদার মতো। মূলত ইউরোপীয় রীতিতে নাটক রচনার কথা ভাবলেও ভারতীয় রীতি অনুসারে নাটকে মধুসূদন দত্ত একটি বিদূষক চরিত্র সংযুক্ত করেন। কালিদাসের 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকের মতোই তিনিও তাঁর 'শর্ম্মিষ্ঠা নাটক'-এর বিদূষকের নাম মাধব্য রেখেছেন। এই চরিত্রটি মহাভারতে না থাকলেও মধুসূদনের নাটকে বেশ গুরুত্বপূর্ণ জায়গা পেয়েছে। নাটকের প্রয়োজনে বকাসুর ও অন্য একজন দৈত্য চরিত্রকেও তিনি সংযুক্ত করেছেন। এই দুটি চরিত্রের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে নাটকের ঘটনা উপস্থাপিত হয়েছে। এছাড়া দেবযানী ও যযাতির বিবাহের পরবর্তী সময়ে বকাসুরকে দেখা গেছে শর্মিষ্ঠাকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করে পিতৃগৃহে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে প্রতিষ্ঠানপুরীতে গমন করতে। মধুসূদনের 'শর্ম্মিষ্ঠা নাটক'-এর এই অংশটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং তাঁর মৌলিক কল্পনা থেকে জাত। এছাড়া, একজন নটী চরিত্রকেও তিনি নাটকে সংযুক্ত করেছেন। সমকালীন অন্যান্য বাংলা নাটকের ঐতিহ্য, দর্শকদের রুচি ও হাস্যরসের উপস্থাপনের বিষয়টি এই চরিত্রটি সংযোগের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ কারণ বলে মনে করা যেতে পারে। এছাড়াও একজন ব্রাহ্মণ, দৌবারিক, নাগরিকগণ, সভাসদগণ, একজন পরিচারিকা, দুইজন চেটী ইত্যাদি অপ্রধান চরিত্র নাটকে সংযুক্ত হয়েছে। নাট্যকাহিনি উপস্থাপনের প্রয়োজনীয়তা এবং কাহিনিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এই চরিত্রগুলির সংযোজন প্রয়োজন ছিল।

আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে পরিবর্তনসাধনের পরিবর্তে মহাভারতে বর্ণিত মূল ঘটনা বজায় রাখলে তা নাট্যক্রিয়ার ক্ষেত্রে অনেক বেশি সহায়ক হতে পারত বলে আমাদের মনে হয়। সমালোচক শশাঙ্কমোহন সেন তাঁর 'মধুসূদন' নামক প্রবন্ধ-গ্রন্থে 'শর্ম্মিষ্ঠা নাটক' চিরন্তন সাহিত্যাদর্শের দৃষ্টিতে সার্থক নাটক হয়ে উঠতে পারেনি বলে মন্তব্য করেছেন। তাঁর মতে, মহাভারতের যযাতি-উপাখ্যানের মধ্যে নাটকীয় কৃতিত্ব প্রকাশের যে-সমস্ত অবকাশ ছিল, মধুসূদন তার সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে পারেননি।[১৫] এ-প্রসঙ্গে মহাভারতে বর্ণিত বেশ কিছু অংশের সঙ্গে 'শর্ম্মিষ্ঠা নাটক'-এর আমরা তুলনামূলক আলোচনা করব।

প্রথমত, মহাভারতে দেবযানী ও শর্মিষ্ঠার দ্বন্দ্বের পিছনে দেবরাজ ইন্দ্রের কুটকৌশল ছিল। মধুসূদন এই ঘটনাটি তাঁর নাটকে একেবারেই উল্লেখ করেননি। এটি উল্লেখ করলে তাঁর শর্মিষ্ঠা চরিত্র দর্শকের কাছে নির্দোষ হিসেবে উপস্থাপিত হতে পারত। শর্মিষ্ঠার যে বিনয়নম্র ভাব তিনি প্রকাশ করেছেন, তা তাতে আরও বেশি বজায় থাকত। শর্মিষ্ঠা চরিত্রটিও দর্শকদের আরও বেশি মনোযোগ ও সমবেদনা আকর্ষণ করতে পারতেন বলেও আমাদের মনে হয়।

দ্বিতীয়ত, মহাভারতে দেখা গেছে শর্মিষ্ঠার দেবযানীর দাসত্ব স্বীকারের শর্ত দেবযানী নিজেই দিয়েছেন। কিন্তু মধুসূদনের নাটকে শুক্রাচার্যকে এই শর্ত দিতে দেখা যায়, "এ পাপের আর প্রায়শ্চিত্ত কি আছে? তোমার কন্যা চিরকাল দেবযানীর দাসী হয়ে থাকুক, এই আমার ইচ্ছা।"[১৬] এই শর্ত দেবযানীর মুখেই যদি প্রকাশিত হত, তাহলে তা অপেক্ষাকৃত বেশি গ্রহণযোগ্য হত। তাতে ব্যক্তিত্বময়ী দেবযানী চরিত্রটি আরও বেশি প্রকটিত হতে পারত। প্রতিনায়িকা হিসেবে তাঁকে দর্শকদের কাছে আরও বেশি নিষ্ঠুর হিসেবে দেখানো সম্ভব হত, যা 'শর্ম্মিষ্ঠা নাটক'-এর গঠনে শক্তিশালী ভূমিকা পালন করত।

তৃতীয়ত, মহাভারতে প্রথম থেকেই যযাতির আগ্রহ ছিল শর্মিষ্ঠার প্রতি। শর্মিষ্ঠা কী কারণে দেবযানীর পরিচারিকা হয়েছেন, তার কারণ তিনি জিজ্ঞাসা করেন, "সুন্দরি! ইনি দানবরাজ বৃষপর্ব্বার কন্যা হইয়া কি কারণে তোমার দাসী হইলেন, জানিতে নিতান্ত ঔৎসুক্য হইতেছে।"[১৭] অন্যদিকে দেবযানী শর্মিষ্ঠার প্রতি

যযাতির অনুরাগ বুঝতে পেরে সে-বিষয়টি এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে বলেন, "দৈবনির্বন্ধ কেহই অতিক্রম করিতে পারে না, সুতরাং রাজকন্যা যে আমার পরিচারিকা হইবে, ইহা বড় আশ্চর্য্য নহে, সে বিষয়ের আর বিশেষ অনুসন্ধান করিবার আবশ্যকতা নাই।"[১৮] দেবযানী যযাতিকে বিবাহের প্রস্তাব দিলে যযাতি বিভিন্ন যুক্তির মাধ্যমে তা অস্বীকার করতে চান, "হে শুক্রতনয়ে! ইহা তোমার শ্রেয়ঃকল্প নহে; দেখ, তুমি ব্রাহ্মণকন্যা, আমি ক্ষত্রিয়জাতি, আমি কোনরূপেই তোমার উপযুক্ত পাত্র নহি, আর তোমার পিতা শুক্রাচার্য কদাচ এই বিষয়ে সম্মতি প্রদান করিবেন না।"[১৯] সমালোচক নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী তাঁর 'মহাভারতের ভারতযুদ্ধ এবং কৃষ্ণ' গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে যযাতির দেবযানীকে বিবাহে অস্বীকারের প্রকৃত কারণ হিসেবে মনে করেছেন, "এক, দেবযানীর থেকে দৈত্যকুমারী শর্মিষ্ঠা তাঁর বেশি মনপসন্দ। দুই, দেবযানীকে সোজাসুজি প্রত্যাখ্যান করলে তাঁর রাগ হবে এবং সেই রাগ তাঁর পিতা শুক্রাচার্যের মধ্যেও সংক্রামিত হবে। ফল রাজার পক্ষে ভয়ানক হতে পারে।"[২০] সুতরাং, মহাভারতে যযাতি কিছুটা অনিচ্ছাসত্ত্বেও দেবযানীকে বিবাহ করেছিলেন এবং শর্মিষ্ঠার প্রতি তাঁর অনুরাগ প্রথম থেকেই ছিল বলা যেতে পারে। নাটকেও বিষয়টি একইভাবে বর্ণিত হলে নায়িকা হিসেবে শর্মিষ্ঠা চরিত্রটি আরও বেশি গুরুত্ব পেত। প্রতিনায়িকা হিসেবে দেবযানীকেও আরও বেশি সক্রিয় ভূমিকায় পাঠক বা দর্শক দেখতে পেতেন। যযাতি ও শর্মিষ্ঠার প্রণয়ও নাটকে আরও গ্রহণযোগ্যতা পেত। কিন্তু মধুসূদনের 'শর্ম্মিষ্ঠা নাটক'-এ দেখা যায় যযাতি প্রথমে ছিলেন দেবযানীর প্রতি অনুরক্ত। দেবযানীর বিরহে তাঁকে কাতর হতে দেখা যায়— "হা পরমেশ্বর! সে চন্দ্রানন কি আর এ জন্মে দর্শন করবো! আহা! ঋষিতনয়ার কি অপরূপ রূপলাবণ্য! (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হা অন্তঃকরণ! তুমি কি সেই নির্জন বন এবং সেই কূপতট হতে আর প্রত্যাগমন করবে না? হায়! হায়! সে কূপের অন্ধকার কি আর সে চন্দ্রের আভায় দূরীকৃত হবে?"[২১] আবার দেবযানীকে বিবাহ ও পুত্র জন্মের পর শর্মিষ্ঠার প্রতি যযাতির অনুরাগ সঞ্চারিত হতে দেখা যায় একইভাবে। বিদূষক মাধব্যের কাছে তাঁর মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে এইভাবে— "আহা! সখে, তার কি রূপমাধুর্য্য! তার পদ্মনয়ন দর্শন করলে পদ্মের উপর ঘৃণা জন্মে। আর তার মধুর অধরকে রতিসর্ব্বস্ব বললেও বলা যেতে পারে।"[২২] 'শর্ম্মিষ্ঠা নাটক'-এ যযাতির এই প্রথমে দেবযানীর প্রতি ও পরবর্তী সময়ে শর্মিষ্ঠার প্রতি রূপজ আকর্ষণ তাঁকে রোমান্টিক নায়কের পর্যায়ে উন্নীত হতে বাধা দিয়েছে। পরিবর্তে তা তাঁকে একজন রূপলোলুপ দুর্বলচিত্ত চরিত্রে পরিণত করেছে। সমালোচক শশাঙ্কমোহন সেন এ-প্রসঙ্গে মধুসূদন আধুনিকমনস্ক সাহিত্যিক হয়েও যযাতির "দ্বিচারিণী প্রীতি"-র প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে নাটক লিখলেন কেমন করে তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।[২৩] আবার সমালোচক ড. অজিতকুমার ঘোষও এই বিষয়টিকে 'শর্ম্মিষ্ঠা নাটক'-এর একটি দুর্বল দিক বলেই মনে করেছেন— "রাজার পক্ষে একই ভাবে একবার দেবযানীর প্রতি এবং আবার শর্মিষ্ঠার প্রতি আসক্ত হওয়ার চিত্র কাহিনীর রস-সৃজনে পরিপন্থী হইয়াছে।"[২৪] তুলনায় মহাভারতের যযাতি উপাখ্যানে বর্ণিত প্রথম থেকেই শর্মিষ্ঠার প্রতি যযাতির অনুরাগ এবং দেবযানীকে বাধ্য হয়ে বিবাহ করার বিষয়টি হুবহু নাট্যরূপায়িত করলে তা অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য হত। নাটকের গঠন যেমন আরও শক্তিশালী হত, তেমনই রোমান্টিক নায়ক চরিত্র হিসেবে যযাতিও পাঠক বা দর্শকের কাছে আরও বেশি আকর্ষণীয় হতে পারতেন।

চতুর্থত, মহাভারতে দেবযানী ও যযাতির বিবাহের সময় শুক্রাচার্য যযাতিকে বলেছিলেন, "...এই অসুররাজকুমারী শর্মিষ্ঠা তোমার পূজনীয়া হইবেন; তুমি কদাচ ইঁহাকে পরিণয় করিও না।"[২৫] কিন্তু মধুসূদনের নাটকে শুক্রাচার্যের এরকম কোনো সাবধানবাণী নেই। তাই যযাতির শর্মিষ্ঠাকে গ্রহণের পর

শুক্রাচার্যের অভিশাপে তাঁর বার্ধক্য প্রাপ্তি ততটা নাটকীয় হয়ে ওঠে না। যযাতির প্রতি শুক্রের এই সাবধানবাণী পূর্বে উল্লিখিত থাকলে তা লঙ্ঘনের কারণে যযাতির অভিশাপ প্রাপ্তি অনেক বেশি আকর্ষণীয় হত। তাই এই অংশটির বর্জন মধুসূদনের নাটকের গঠনের ক্ষেত্রে দুর্বলতার কারণ হয়েছে বলা যায়।

সুতরাং, মধুসূদন তাঁর 'শর্ম্মিষ্ঠা নাটক' রচনা করতে গিয়ে মহাভারতের কাহিনিকে অবলম্বন করলেও তার প্রচুর রূপান্তর করেছেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন নাটকের প্রয়োজনে। আবার এমন কিছু পরিবর্তনও তিনি করেছেন, যেগুলি অপরিহার্য ছিল না। বরং কিছু ক্ষেত্রে মহাভারতের বর্ণিত বিষয়ের হুবহু নাট্যরূপ দান করলে তা অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য হতে পারত। 'শর্ম্মিষ্ঠা নাটক'-এর নাট্যমূল্য তাতে অনেক গুনে বৃদ্ধি পেত সন্দেহ নেই। নাট্যকার হিসেবে তাঁর যে অভিপ্রায়, তাও তাতে আরও বেশি পরিস্ফুট হতে পারত।

মধুসূদন দত্তের 'শর্ম্মিষ্ঠা নাটক' মহাভারতের যযাতি-উপাখ্যানের উপর ভিত্তি করে রচিত হলেও মহাভারতের কাহিনির হুবহু নাট্যরূপ তিনি বর্ণনা করেননি। সমকালীন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আবহ নাটকের কাহিনি ও চরিত্রগুলিতে প্রাধান্য বিস্তার করেছে। আমরা এই আলোচনায় তা দেখিয়েছি। নাটকের প্রয়োজনেও মহাকাব্যের মূল ঘটনার বেশ কিছু গ্রহণ, বর্জন ও রূপান্তর তাঁকে করতে হয়েছে। এগুলি কিছু কিছু ক্ষেত্রে সার্থক হলেও অনেক ক্ষেত্রে নাট্যরস ও নাট্যক্রিয়ার নির্মিতির পক্ষে যে সহায়ক হয়নি, তাও আমরা দেখিয়েছি।

তথ্যসূত্র:

1) 'মধুসূদনের কাব্য-প্রতিভায় 'মিথ'-এর প্রয়োগ', মানস মজুমদার, 'মধুসূদন: সাহিত্যপ্রতিভা ও শিল্পী-ব্যক্তিত্ব', সম্পাদনা- দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ, পুথিপত্র, ৯ এ্যান্টনী বাগান লেন, কলিকাতা- ৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ, ৫ অক্টোবর ১৯৮৬, পৃষ্ঠা- ২৮০
2) 'মাইকেল মধুসূদন', 'বাংলা নাটকের ইতিহাস', ড. অজিতকুমার ঘোষ, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৮৩, পঞ্চম সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০১৬/ আশ্বিন ১৪২৩, পৃষ্ঠা- ৭১
3) ঐ, পৃষ্ঠা- ৭১
4) 'মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-বিরচিত মহাভারত', কালীপ্রসন্ন সিংহ, সাক্ষরতা প্রকাশন/ পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি, বিদ্যাসাগর সাক্ষরতা ভবন, ৬০ পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা ৯, প্রথম খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, ৪ মার্চ ১৯৭৪/ ২০ ফাল্গুন ১৩৮০, পৃষ্ঠা- ৮৫-৯৮ (অতঃপর 'মহাভারত', কালীপ্রসন্ন সিংহ)
5) 'মধুসূদনের পুরাণ ভাবনা ও বাংলা নাটক', তপন মণ্ডল, 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা', পত্রিকাধ্যক্ষ- রমেনকুমার সর, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা- ৭০০০০৬, ১৩০ বর্ষ, ৩ সংখ্যা, ১৪৩০, পৃষ্ঠা- ৩০৪

6) 'মহাভারত', কালীপ্রসন্ন সিংহ, পৃষ্ঠা- ৮৯
7) 'শর্ম্মিষ্ঠা নাটক', মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ২৪৩/১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা- ৭০০০০৬, পুনর্মুদ্রণ অগ্রহায়ণ ১৪১৭, পৃষ্ঠা- ৪১। (অতঃপর 'শর্ম্মিষ্ঠা নাটক')
8) 'মহাভারত', কালীপ্রসন্ন সিংহ, পৃষ্ঠা- ৯০
9) 'মধুসূদনের পুরাণ ভাবনা ও বাংলা নাটক', তপন মণ্ডল, 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা', পত্রিকাধ্যক্ষ-রমেনকুমার সর, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা- ৭০০০০৬, ১৩০ বর্ষ, ৩ সংখ্যা, ১৪৩০, পৃষ্ঠা- ৩০৬
'ফিরে দেখা 'শর্ম্মিষ্ঠা' ', আশুতোষ বিশ্বাস, 'কৃত্তিবাস', সম্পাদক- বীজেশ সাহা, ১৮এ গোবিন্দ মণ্ডল রোড, কলকাতা- ৭০০০০২, বর্ষ ৯ সংখ্যা ৪-৫, ১৬ জানুয়ারি- ১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪, পৃষ্ঠা- ৯০।
10) 'শর্ম্মিষ্ঠা নাটক', পৃষ্ঠা- ৪৯
11) ঐ, পৃষ্ঠা- ৬২।
12) 'মধুসূদনের পুরাণ ভাবনা ও বাংলা নাটক', তপন মণ্ডল, 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা', পত্রিকাধ্যক্ষ-রমেনকুমার সর, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা- ৭০০০০৬, ১৩০ বর্ষ, ৩ সংখ্যা, ১৪৩০, পৃষ্ঠা- ৩০৭
13) ঐ, পৃষ্ঠা- ৩০৫
14) ঐ, পৃষ্ঠা- ৩০৫
15) 'মধুসূদন (অন্তর্জীবন ও প্রতিভা)', শশাঙ্কমোহন সেন, প্রকাশক- শ্রীঅমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়, ম্যানেজিং ডিরেক্টার, এ. মুখার্জি অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ, ২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা- ১২, সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৫৯, পৃষ্ঠা- ৬১
16) 'শর্ম্মিষ্ঠা নাটক', পৃষ্ঠা- ৭
17) 'মহাভারত', কালীপ্রসন্ন সিংহ, পৃষ্ঠা- ৮৮
18) ঐ, পৃষ্ঠা- ৮৮
19) ঐ, পৃষ্ঠা- ৮৮
20) 'মহাভারতের ভারতযুদ্ধ এবং কৃষ্ণ', নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম সংস্করণ একাদশ মুদ্রণ, পৃষ্ঠা- ১২৮।
21) 'শর্ম্মিষ্ঠা নাটক', পৃষ্ঠা- ২২
22) ঐ, পৃষ্ঠা- ৩৪
23) 'মধুসূদন (অন্তর্জীবন ও প্রতিভা), শশাঙ্কমোহন সেন, প্রকাশক- শ্রীঅমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়, ম্যানেজিং ডিরেক্টার, এ. মুখার্জি অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ, ২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা- ১২, সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৫৯, পৃষ্ঠা- ৬০
24) 'মাইকেল মধুসূদন', 'বাংলা নাটকের ইতিহাস', ড. অজিতকুমার ঘোষ, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৮৩, পঞ্চম সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০১৬/ আশ্বিন ১৪২৩, পৃষ্ঠা- ৭২
25) 'মহাভারত', কালীপ্রসন্ন সিংহ, পৃষ্ঠা- ৮৯